সংবাদ

তারিখ ... 08 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...১...

সবাই যা দেখে

নোট-গাইড-কোচিং ও ঝরেপড়া রোধকল্পে কিছু কথা

আব্দুল মান্নান খান

একই কথা বারবার বলা শোভন নয়– এমনই জানা ছিল। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। এমন কথা থাকে যা একবার কেন বারবার বলতে হয়। প্রয়োজনে সহস্র বারও বলতে হতে পারে। যেমন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বারবার বলতে হবে। বারবার ভাবতে হবে। লেখাপড়ার ভিতটা মজবুত না হলে সব নড়বড়ে হয়ে যাবে। উচ্চশিক্ষা যেভাবে বেসরকারি পর্যায়ে চলছে যাক না। যার মেধা আছে যার আর্থিক সমর্থ আছে সে উচ্চশিক্ষায় যাবে। মেধাবীদের জন্য ছাত্রবৃত্তির প্রথা তো রয়েছেই সেটা আরও জোরদার করলেই চলবে। দেখতে হবে তারা যেন কোন অবস্থায় ঝরে না যায়। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো রয়েছে সেটা তো থাকছেই। অতএব সবকিছুর মূলে যে প্রাইমারি শিক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে সেখানে। তবে তার আগে ঠিক করে নিতে হবে প্রাইমারি শিক্ষা কোন শ্রেণী পর্যন্ত হবে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হলে সেটায় হোক বা নবম শ্রেণী পর্যন্ত করতে চাইলে তাও হতে পারে। চীনদেশে সবাইকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে হয়। এর মধ্যে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়র হাই। এ ৯ ক্লাস লেখাপড়া করা তাদের সবার জন্য একেবারে বাধ্যতামূলক। তা সে যে শ্রেণী পর্যন্তই নির্ধারিত হোক না কেন, সে পর্যন্ত আমাদের সকল শিশুকে টেনে তুলতে হবে। তারপর তাদের পাবলিক পরীক্ষায় বসিয়ে দিতে হবে সে পরীক্ষার নাম যাই হোক। সেটাও পুরো দেশ নিয়ে না করলেও চলতে পারে। ওই যে চীনের কথা বললাম, ওদের লোকাল এডুকেশন ব্যুরো অফিস এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। ফলাফল মোতাবেক সার্টিফিকেট ইস্যু করেন যার যার জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধানদ্যাকে ওরা প্রিন্সিপাল বলে।

সে যাহোক, আমাদের ভালো আমাদের কাছে। ওই পর্যায়ে অর্থাৎ ৮-৯ ক্লাস পড়ার পরে যদি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই পরীক্ষার পর যে সার্টিফিকেট তারা হাতে পাবে সেই সার্টিফিকেট বলে তারা তখন লেখাপড়া জানা লোক হিসেবে সমাজে বিবেচিত হবে। এবং সেই সার্টিফিকেট বলে তারা সরকারের সর্বনিম্ন পদে নিয়োগের আবেদন করতে পারবে। সে সময় তাদের বয়সটাও দাঁড়িয়ে যাবে একটা কিছু করে খাওয়ার মতো। সবাই তো আর উচ্চ শিক্ষায় যাবে না এবং সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু এখন যে পিএসসির সার্টিফিকেট তারা হাতে পাচ্ছে এই সার্টিফিকেট পিএসসির পরে যারা আর পড়তে পারল না তাদের কোনো কাজে লাগবে না। যেটুকু শিখবে দু'দিন না যেতেই তা ভুলে যাবে। বেশ ক'বছর তো হলো পিএসসি পরীক্ষা হচ্ছে পাশের হার শতভাগের মতোই। এর চেয়ে ভালো আর কোন খবর হয় না। এখন কথা হলো এরা সবাই কি জেএসসি পর্যন্ত যেতে পেরেছে। যারা পারল না ঝরে গেল তারা ওই সার্টিফিকেট দিয়ে কী করবে। এখন বলতেই হয় এই পিএসিই বরং উল্টো প্রাইমারির কোমলমতি শিশুদের ঘাড়ে নোট-গাইড আর কোচিং এর মতো বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। 'শৈশবের আনন্দটুকু' নষ্ট করেছে।

গ্রামে এখন বলা যায় সবশিশুই স্কুলে যায়। স্কুল বলতে প্রাইমারি পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন সরকারি-বেসরকারি, এবতেদাই নূরানি হাফেজী কওমী মক্তব পাঠশালা কিন্ডারগার্টেন যাইই বলা হোক না কেন আর যায়-ই সেখানে পড়ান হোক না কেন তারা পড়ছে তারা স্কুলে যাচ্ছে। বলতেই হবে এটা একটা অভাবনীয় অগ্রগতি। আমরা কি কোন দিন ভাবতে পেরেছি আমাদের সব শিশু একদিন স্কুলে যাবে। বেশ কয়েক বছর আগের একটা কথা বলি, পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে আমাদের দেশকে ঘোষণা দেয়ার আগে একবার এক ভদ্রলোককে বলতে শুনেছিলাম, আপনারা এখনো বুঝতে পারেন নাই কত বড়ো একটা কাজ আপনারা করে ফেলেছেন'। ঠিকই বাংলাদেশ এখন পোলিওমুক্ত। এখন আর সুস্থ কোন শিশু পোলিও রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে না। সে রকমই একটা ঘটনা আসলে ঘটে গেছে আমাদের প্রাইমারি শিক্ষা ক্ষেত্রে। তবে হ্যাঁ, শহরে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। আমরা ওদের টোকাই, ভবঘুরে বা পথশিশু বলে থাকি। আরেকটা অংশ বাসায় বাসায় কাজ করে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাদের আমরা শিশুশ্রমিক বলি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, 'কোন শিশু রাস্তায় জীবনযাপন করবে না'। কাজেই আশা করা যায় ওরাও লেখাপড়ার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়বে খুব শিগগির। আর গ্রাম থেকে এসে যারা শিশুশ্রমিকের অভিশাপে পড়ছে তাদের লেখাপড়ার মধ্যে নিতে হবে গ্রামে রেখেই। সে কথায় পরে আসছি।

যখন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিশুরা স্কুলে তালপাতায় লিখত যখন স্কুলে সবাই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে 'ডাক' পাড়ত– কয়া কারে কা, কয় কিারে কি, যখন আমাদের নদী-খাল-বিল পাড়ি দিয়ে রোদবৃষ্টি মাথায় নিয়ে স্কুলে যেতে হতো, যখন শিক্ষকের মারের ভয়েই বেশিরভাগ শিশুরা স্কুল ছাড়ত যখন খুব কম পরিবারের মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেত– এমন সব বিষয় থেকে শুরু করে বর্তমানের নোট-গাইড বই, কোচিং, কারিকুলাম, পরীক্ষায় নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ-বদলি, শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের ভূমিকা, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি, চীনদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে এ কলামে (কখনো ৬ কখনো ৭ পৃষ্ঠায়) আমি লিখে আসছি বছর দুই হলো। লিখেছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে প্রায় ত্রিশ বছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরাধীন চাকরি করে আসার সুবাদে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে। ঠিক করেছি আজকের এ লেখা দিয়ে ইতি টানব প্রাইমারি শিক্ষা নিয়ে লেখালেখির। তবে শেষ করতে চাই আগে যা লিখেছি তা থেকে কিছু কথা পুনরায় ব্যক্ত করে। যেমন –

ক. পদ খালি রেখে : সারা দেশে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি রেখে কখনোই বলা যাবে না প্রাইমারি স্কুলের লেখাপড়া ভালো চলছে। কেন্দ্র থেকে নিয়োগ দিয়ে এ অভাব পূরণ করা যাবে না। একদিকে পূরণ হতে থাকবে আরেক দিকে খালির পরিমাণ যা তা সৃষ্টি হতেই থাকবে। মাঝখান দিয়ে পাঁচ শিক্ষকের স্কুল ২-৩ জন শিক্ষককেই চালিয়ে নিতে হবে দড়কচড়া মার্কা শিক্ষা দিয়ে। কেন্দ্রীয়ভাবে একবার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আরেকবার নিয়োগে আসতে একটা লম্বা সময় লেগে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই শিক্ষক নিয়োগ জেলা কমিটির কাছে অথবা পাশাপাশি দুই জেলা নিয়ে নিয়োগ কমিটি করে দিয়ে সেই কমিটির কাছে ছেড়ে দেয়া দরকার অথবা এমনই কোন উপায় খুঁজে বের করা দরকার। তাহলে নিয়োগের কাজও তাড়াতাড়ি হবে এবং জবাবদিহিতার ব্যাপারটাও নিশ্চিত করা যাবে। কেন্দ্র কেবল মনিটরিং করবে।

খ. পোস্টিং সুবিধা : প্রত্যেক শিক্ষককে তার সুবিধামতো স্কুলে পোস্টিং দিতে হবে তাদের কাছ থেকে অপশন চেয়ে নিয়ে। প্রথম নিয়োগের সময় থেকেই একাজ করতে হবে। এ সময় জেলার এ-মাথার লোক ও-মাথায় দেয়ার কান্ডকারখানা বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আজকাল প্রত্যেকটা মানুষ বহুমুখী কাজে ব্যস্ত। শিক্ষকতাকে এখন আর কেউ সেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তার কাজের ক্ষেত্র মসৃণ করে দিলেই না তার কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করা যাবে। মনে রাখতে হবে এখন আর কোন শিক্ষক ছাত্রের বাড়ি লজিং থাকতে যায় না।

গ. বিদ্যালয় কমিটি: বিদ্যালয় কমিটিতে স্থানীয় শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকজনের প্রবেশ ঘটাতে হবে। স্থানীয় কর্মকর্তা আর শিক্ষক মহোদয়রা মিলে যেভাবে চাইবেন সেভাবেই চলবে –শিক্ষক যখন আসবেন তখন ক্লাস শুরু হবে এ আর কতকাল চলবে। সেদিন ২৪-০৪-১৬ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোয় জনাব আবুল মোমেন শিক্ষার অগ্রগতি সমস্যা এবং সমাধানের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার ওপরে আর কথা চলে না। সেখানে এ বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন, 'সমাজের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের যেমন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উৎসাহী পেশাজীবী, সংস্কৃতি সংগঠক প্রমুখকে– নিজ নিজ এলাকার স্কুল তদারকিতে যুক্ত করা প্রয়োজন'। আমিও তার কথার সঙ্গে বলতে চাই, এমন সব ব্যক্তিবর্গের কেউ একজন ১০টার স্কুল বেলা ১২টার সময় গিয়ে যদি দেখেন স্কুল তখনো শুরু হয়নি অথবা যদি দেখেন ৫ জন শিক্ষকের স্কুলে ২ জন বা ৩ জন হাজির আছেন তাহলে কেন তিনি সেটা পরিদর্শন বইতে লিখে আসতে পারবেন না। এক সময় তো মনে পড়ে একজন পরিদর্শক বা অমন বিদ্যোৎসাহী কেউ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন বই দেখতে চাইতেন। আগের জন কী বলে গেছেন সেটা দেখতেন। কোন সমস্যার কথা বলা হয়ে থাকলে তার সমাধানের জন্য কী করা হয়েছে খোঁজখবর নিতেন। যাহোক, ওই পর্যায়ের বিদ্যোৎসাহী লোকজনের জন্য পরিদর্শন বই উন্মুক্ত রাখা দরকার। প্রকৃত জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন মনে করলে ওই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমার জানা একটা স্কুলের কথা বলি। যে গ্রামে একটা গার্লস হাইস্কুল থাকতে পারে সে গ্রামের ওই স্কুলের সভাপতি পদের জন্য একজন শিক্ষিত লোক পাওয়া যাবে না একথা এখন আমার মনে হয় কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ঘটনা সত্য, যাকে সভাপতি করা হয়েছে তার কোন পাশটাশ নেই। আবার বয়সও কম। শোনা যায় যাদের হুকুমে এমন হতে পারে তারা চেয়েছেন বলে হয়েছেন। ভাবখানা যেন এমন লেখাপড়া জানা লোক-স্পষ্টবাদি লোক যত দূরে থাকে ততই ভালো। স্পষ্টবাদিতার কথা যখন উঠল তখন একটা গল্প বলি। গল্পটা আমাকে শুনিয়েছিল ফেনীরই আমার এক বন্ধু। ফেনী কলেজের টাকা-পয়সা হিসাবে মিলতেছে না। টাকার এমন গরমিল নিয়ে কমিটিতে কথা উঠেছে। তখন কমিটির একজন বলে উঠলেন, 'হেনী কলেজের হয়সা লই, চুদুরবুদুর চলতো নো'। তার মানে হলো ফেনী কলেজের টাকা-পয়সা নিয়ে কোন চলচাতুরি করা চলবে না। দারুণ কথা। এমন মানুষজনই তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলোতে থাকা দরকার। এখন যদি কেউ মনে করেন কমিটির লোকজন সব নিজের লোক না হলে অসুবিধা তা হলে তারা কেন চাইবেন এলাকার ওই সব লোকজন স্কুল কমিটিতে আসুক বা যখন তখন উপস্থিত হয়ে একটু খোঁজখবর করুক।

ঘ. পরিদর্শন ও কারিকুলাম : প্রাইমারির বিদ্যালয় পরিদর্শকরা যদি চান এবং সে দক্ষতা যদি দেখাতে পারেন তাহলে নোট-গাইড এবং কোচিং বাণিজ্য প্রতিরোধের ব্যাপারে বড় ভূমিকা তারাই রাখতে পারেন। এর জন্য প্রথমে তাদের পরিদর্শক হতে হবে। এখন প্রাইমারি শিক্ষায় কেউ তো আর পরিদর্শক নেই। সবাই অফিসার। অফিস সামলাতেই ব্যস্ত। অফিস তো সামলাতেই হবে কিন্তু পরিদর্শনের জন্য মাঠে নামতে হবে পরিদর্শক হয়েই। সময় দিতে হবে শ্রেণীকক্ষে। শ্রেণীকক্ষে পৌছানোর আগেই যদি ঘড়ি দেখতে থাকেন তা হলে যেটা হবে– ভালো খাওয়া-দাওয়া হবে ফেরত টিকিট পাওয়া যাবে যেখানে যে জিনিসটা ভালো পাওয়া যায় সেটা এমনিতেই এসে যাবে। তার সাথে ১ম শ্রেণীর টিএ/ডিএ তো রয়েছেই। মাফ করবেন ব্যতিক্রম নেই তা বলছি না। নোট-গাইড এবং কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত এমন একটা চক্র প্রায় সর্বত্র কাজ করে যাচ্ছে। তারা কোন উর্ধ্বতনকে কোন অবস্থায় শ্রেণীকক্ষ পর্যন্ত যেতে দিতে চায় না। অফিস থেকেই বিদায় করতে চায়। উর্ধ্বতন বলতে জেলা-বিভাগ ও অধিদফতরের কর্মকর্তাদের কথা বলছি। তারা যদি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন একটা শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকে দেখেন, পাঠদানরত শিক্ষক কী পড়াচ্ছেন কেমন করে পড়াচ্ছেন– শিশুরা সেটা কীভাব নিচ্ছে বা নিতে পারছে কিনা তা হলেই না তিনি ধরতে পারবেন গলদটা কোথায়? ধরতে পাবেন কেন প্রাইমারি স্কুলের কোমলমতি শিশুদের ওপর এভাবে নোট-গাইড ও কোচিং এর মতো অভিশাপ এমনভাবে চেপে বসেছে। শ্রেণীকক্ষে সহজ জিনিসটাকে বুঝে বা না বুঝে কঠিনভাবে পাঠদান করা হচ্ছে কিনা। যেটা পড়ান হচ্ছে সেটা ওই শ্রেণীর শিশুদের জন্য আসলেই কঠিন হয়ে গেছে কি-না। নাকি সবকিছু কঠিনের মধ্যে ফেলে কঠিনভাবে প্রশ্ন করে শিশুদের ঘাবড়ে দেয়া হচ্ছে। অনুমোদিত পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোন বই শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা। নোট-গাইড পড়ান হচ্ছে কিনা। শিক্ষার্থীরা নোট-গাইড পড়ছে কিনা বা তারা সেটা বহন করছে কিনা, স্কুলের পরে তাদের বাধ্যতামূলক কোচিং করতে হচ্ছে কিনা– এসব জানা একজন পরিদর্শকের জন্য সহজ কাজ কারণ শিশুরা মিথ্যা কথা বলবে না। শেখান কথা বললেও সবাই বলবে না। পরিদর্শককে আরো গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা জানতে হবে তাহলো, যে বিষয় পড়ান হচ্ছে, যে ভাবে পড়ান হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হচ্ছে কিনা। সেখানে কারিকুলামের কোন বিচ্যুতি ঘটছে কিনা। এ বিষয়টা বার বার পরিদর্শনে স্পষ্ট হবে একবারে হবে না। আর এটাই হলো নোট-গাইড-কোচিং কারবারের মূল জায়গা। ঠেকাতে হবে এখানেই। কারিকুলামে গলদ থাকলে পরের পদক্ষেপগুলোতে গলদ সৃষ্টি হতে বাধ্য। নোট-গাইড- কোচিং-এর মতো অভিশাপগুলো এখান থেকেই সৃষ্টি হবে। তাই গভীরভাবে পরিদর্শককে এ বিষয় জানতে হবে। এর জন্য তার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। কারণ কারিকুলামের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাকেই সেগুলো শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে এনে সংশোধনের জন্য রিপোর্ট করতে হবে। এ কারণেই তো কারিকুলাম নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখার কোন বিকল্প নেই।

অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি কারিকুলামের ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি এমন হতে হবে যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা পদ্ধতিও এমন ভাবে সাজাতে হবে যে নোট-গাইড-কোচিংয়ের কথা কেউ ভাবতে না পারে। প্রশ্নপত্র যদি পাঠদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয় এবং ক্লাসের সব ধরনের ছাত্রছাত্রীর কথা মাথায় রেখে পাঠদান এবং প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয় তাহলে এসব কোমলমতি শিশুদের অভিভাবকসহ নোট-গাইড আর কোচিং এর পিছনেও ছুটতে হয় না। ছুটতে হয় না নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের পিছনে। বিস্তর অর্থও ব্যয় করতে হয় না। অর্থ যার আছে তিনি তো তার সন্তানের ভালোর জন্য ব্যয় করবেনই। সন্তানের ভালোর জন্য অর্থ ব্যয়ের বহু সৃজনশীল রাস্তা আছে। তার মধ্যে ধরি যদি বছরে একবার কেউ তার সন্তানকে গণ্ডির বাইরে ঘুরতে নিয়ে যান তাহলে সেটাও হবে অনেক সৃজনশীল কাজ। দেশের বাইরে এমন অনেক নজির পাওয়া যাবে যেখানে শিশুরা স্কুলে খালি হাতে যায় খালি হাতে আসে। স্কুলে তাদের একটা করে ডেস্ক আছে সেখানে তাদের লেখাপড়ার সব সরঞ্জাম রেখে আসে পরের দিন আবার গিয়ে খোলে। সেখানে আমাদের সেই একই শ্রেণীর শিশুরা কী করছে পড়ালেখা নিয়ে তা আর কারো বারবার বলতে বা শুনতে ভালো লাগছে না। কেবল দেখে যাচ্ছে।

কারিকুলামের কথায় যখন আসতে হলো তখন একটা কথা এখানে বলে রাখি। এ কথাটা আমি আগেও বলেছি আবারও বলি, প্রাথমিক শিক্ষাকে একটা অভিন্ন কারিকুলামের মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন। মোটামুটি একটা ধারায় একটা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত না হলে একই ধারার মনমানসিকতা নিয়ে কী করে গড়ে উঠবে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আমি বলতে চাইছি প্রাইমারি পর্যায়ে যেখানে যা পড়ান হচ্ছে তার কোনটাকে অমর্যাদা করে নয় কোনটাকে ছোট করে দেখে নয় বরং সবগুলোকে সমন্বিত করে আত্মমর্যাদাশীল এবং বাস্তবমুখী একটা অভিন্ন কারিকুলাম চালু করা দরকার। প্রয়োজন এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা এবং তার থেকে গ্রহণযোগ্য একটা উপায় বের করে আনা। কাজটা করা কঠিন ঠিকই কিন্তু অসম্ভব নয়। একটু বোঝালেই আমাদের দেশের মানুষ সাড়া দেবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে।

ঙ. শেষ করতে চাই ঝরে পড়ার বিষয়টা নিয়ে আমার আগের লেখা থেকে একটু টেনে এনে। এখন স্কুলে ভর্তি প্রায় শতভাগ কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেতে তার থেকে বলা হচ্ছে ঝরে পড়ছে ২০ ভাগ। এটা রোধ কিভাবে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় যে দুটো প্রোগ্রাম ছোট আকারে চালু আছে, সারাদেশে তার ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়ে রোধ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তার একটা হলো স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম আর অন্যটি উপবৃত্তি প্রদান।

ঙ. ০১ স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম: এর সাফল্যের দিক বহুমুখী। একদিকে যেমন ঝরেপড়া রোধ করতে সহায়ক অন্যদিকে শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে সক্ষম। এটা একটা বড় মাপের ভালো কাজ। এখন সীমিত কিছু উপজেলা/থানায় এ প্রোগ্রাম চলছে। সেখানকার স্কুলগুলোর প্রত্যেক শিশুকে প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম ওজনের মানসম্মত-পুষ্টিকর এক প্যাকেট বিস্কুট দেয়া হয়। কেউ বাদ পড়ে না। এর সুফল হাতে পাওয়া গেছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। মায়েরা খুশি মনে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। একটা খাবার তারা সেখানে পাবে। মায়ের কাছে এর অনেক দাম। সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজে যেতে পারেন। সারাদেশে এটা চালু করা গেলে সুফল নিশ্চিত ধরা যায়। এমন ভালো কাজে টাকার অভাব একথা আর দেশের মানুষ মানতে রাজি নয়। কেন নয় তা আর নতুন করে বলতে চাইনে। বরং এখন আশা করতে পারি দেশের সকল স্কুলে এ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। সঙ্গে এটাও আশা করতে পারি আমাদের শিশুরা অচিরেই ওই বিস্কুটের সঙ্গে একটা করে সিদ্ধ ডিমও পাবে।

ঙ.০২ ঝরেপড়া রোধে উপবৃত্তি: মেহনতী শ্রমিক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর এমন সব গরিব মানুষেরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ালেখা করতে পাঠালে কোন খরচ তো লাগবেই না বরং উল্টো তাদের নগদ টাকা দেয়া হবে। সবার জন্য শিক্ষা– এ স্লোগান বাস্তবায়ন করতে এ একটা উৎকৃষ্ট প্রোগ্রাম বলতে হবে। তবে জানা যায় নগর মহানগর পৌরসভা এলাকা এখনো এ প্রোগ্রামের বাইরে রয়েছে। আগেই বলেছি গ্রামের সব শিশু এখন পড়তে যাচ্ছে তা সে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যাক। কিন্তু গরিব পরিবারের শিশুরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে কিন্তু তাদের অভিভাবকরা বেশি দিন তাদের আর স্কুলে রাখছে না তাই তারা ঝরে পড়ছে। গ্রামের স্কুল থেকে ঝরে পড়ে অরা বেশির ভাগ শহরে চলে আসছে। কেউ আসছে বাসাবাড়ির কাজের ছেলে বা মেয়ে হয়ে আবার কেউ হচ্ছে নানা কাজের সস্তা শ্রমিক। আমরা বলি শিশুশ্রমিক। প্রাইমারিতে যে ২০ পার্সেন্ট ঝরে পড়ার কথা বলা হচ্ছে তার সিংহ ভাগ তো এরাই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে ওদের অনেকেই বাড়িতে থাকতে স্কুলে যেত। তাই তো ভর্তির হার প্রায় শতভাগে গিয়ে ঠেকেছে। অতএব ঝরেপড়া ঠেকাতে ওই উৎসে ঠেকা দিতে হবে। অর্থাৎ গ্রাম থেকে যাতে শিশুশ্রমিক হয়ে তারা না চলে আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা করা যেতে পারে এই উপবৃত্তি প্রোগ্রামকে জোরদার করেই। গরিব মা-বাবাই তো ওদের শহরে পাঠান রুজিরোজগারের আশায়। দেখা গেছে নানা ক্ষেত্রের দালালচক্র অগ্রিম টাকা তুলে দেয় ওইসব অভিভাবকদের হাতে। উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এটা রোধ করতে হবে। অল্পসল্প টাকায় তা হবে না। এর জন্য বড় বাজেট লাগবে। সবার জন্য শিক্ষা এবং শিশুশ্রমের অভিশাপ থেকে মুক্তি চাইলে এ ব্যয়ের কোন বিকল্প নেই। স্কুলে এনে খাবারও দিতে হবে আবার পরিমাণ মতো টাকাও ওদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে হবে। এ ব্যয়কে ব্যয় মনে করলে হবে না। ভাবতে হবে এ এক দীর্ঘ মেয়াদি লগ্নি। আবার বাল্যবিবাহ রোধ করার মতো প্রয়োজনে এক্ষেত্রেও আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে যে, অমুক পরীক্ষায় পাস সার্টিফিকেট যার থাকবে না সে কোথাও কোন কাজ পাবে না– তাকে কাজে লাগানও হবে দন্ডনীয় অপরাধ। তবেই না ঝরেপড়া রোধ করা যাবে।